Downloaded from: justpaste.it/2xy7v

অপরাধ প্রতিরোধে তাকওয়ার গুরুত্ব

হাকিমুল ইসলাম ক্বারী মুহাঃ তায়্যেব (রাহঃ)

==========

তাকওয়ার দু'টি অর্থের মধ্যে একটি আল্লাহকে ভয় করা। আর আল্লাহ-ভীতি মানুষের অপরাধ প্রতিরোধের উৎকৃষ্ট পন্থা। অপর দিকে তাকওয়া অর্থ সাবধানতা। অর্থাৎ মানুষ বিধিবদ্ধ জীবন যাপনে বড়-বড় গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট গুনাহ গুলোও পরিত্যাগ করবে, হারাম থেকে মুক্ত থাকার জন্য সাধারণ মকরূহ কাজ সমূহ থেকে সতর্ক থাকবে। হারাম ও মকরূহ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য কোন কোন জায়েয কাজও সযত্নে এড়িয়ে চলবে। সে ভাববে, আজ কোন মকরূহ কাজ করতে গিয়ে না জানি কোনো হারাম কারযে লিপ্ত হয়ে যাই কিনা। অথবা নগন্য জায়েয কোন কর্ম করতে যেয়ে মাকরূহ কাজ করে ফেলি কিনা। শরীয়তের পরিভাষায় এটাকেই বলা হয় "মাধ্যম"। বলা হয়েছে, তোমরা সকল ঝুঁকিপূর্ণ জায়েয কাজ থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর, যাতে নাজায়েয পর্যন্ত পৌঁছার আশংকা রহিত হয়ে যায়। যেমন ব্যভিচার একটি অন্যায় ও হারাম কাজ। ব্যভিচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য বলা হয়েছে, অপরিচিতা গায়রে মুহরিম মহিলার সংস্পর্শ থেকে তোমরা দূরে থাকো, তাদের সাথে নির্জনে অবস্থান করো না, অপরিচিতা মহিলার কথায় অকৃষ্ট হয়ো না।

এসবই মাধ্যম বা উপকরণ-এগুলোই একজন পুরুষকে ব্যভিচারে প্রবলুদ্ধ করে। তাই গুনাহ হতে আত্মরক্ষার পন্থা হিসাবে শরীয়ত এইসব মাধ্যমগুলো থেকে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। কোন অপরিচিতা যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে তাহলে নাক ঘুরিয়ে নিতে হবে। কারণ, সুপ্রাণ পরস্পরে আকর্ষণ সৃষ্টির একটি উপকরণ। ফেকাহ বিশারদগণ লিখেছেনঃ কোন মহিলার অযুকৃত পানির অবশিষ্টাংশ যদি কোন ঘটিতে থাকে তাহলে পরিচিত কোন পুরুষ অযু করতে চাইলে সেই পানি দ্বারা অযু না করে নতুন পানি তুলে অযু করবে। না হয় ঐ মহিলার প্রতি তার মানসিক আসক্তি সৃষ্টি হতে পারে যে, এটুকু অমুক মহিলার অযুকৃত অবিশিষ্ট পানি। এজন্য শরীয়ত গুনাহর প্রারম্ভেই তা প্রতিহত করার পরামর্শ দিয়েছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের কথা হলো তুমি অযুর জন্য নতুন করে পানির ব্যবস্থা কর। না হয় অশুভ ধারণা মনে স্থান করে নিবে, ফলে মনের মধ্যে অন্যায়-অশুভ চিন্তার সৃষ্টি হবে। আর অশুভ চিন্তা থেকেই পাপ কাজের উৎপত্তি ঘটে। যেমন বলাৎকার বা ব্যাভিচার কবিরা গুনাহ। প্রাথমিক পর্যায়ে সগীরা গুনাহ থেকেই এর সূচনা হয়। এ ক্ষেত্রে সগীরা গুনাহ গুলো সযত্নে পরিহার করলে ব্যভিচারের মত কাবিরা গুনাহ পর্যন্ত পৌঁছার আশংকা থাকে না।

চুরি করার অর্থ হলো অন্যের মাল-সম্পদ তার বিনা অনুমতিতে হস্তগত করা। তাই শরীয়ত চুরি বন্ধের লক্ষে প্রথমই বলেছে, অন্যের ঘরে এসে তুমি তার মাল সম্পদের প্রতি লক্ষ করো না। মাল দেখলেই মনে তা সংগ্রহের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই অন্যের মাল উকি ঝুঁকি দিয়ে দেখা সগীরা গুনাহ। হ্যাঁ যদি মালিক নিজেই দেখায়, তাহলে তা দেখে শুকরিয়া আদায় কর। উদাহরণটি একটি হাদীস দ্বারা বুঝতে সহজ হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “যে জাদুকরের কাছে গেল সে শরীয়তে মুহাম্মদী (সোঃ)-এর সাথে কুফুরী করল।” তবে কিন্তু জাদুকরের কাছে যাওয়াটাই কুফুরী নয়। যাদুকরের কাছে গেলেই কারও ঈমান আকীদায় তাওহীদ রিসালাত কিয়ামত ইত্যাদি ধর্ম বিশ্বাসে কোন প্রকার ত্রুটি নাও দেখা দিতে পারে।

কিন্তু একজন লোক যদি যাদুকরের কাছে যায় তাহলে যাদুকরের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকার পর যাদুর ক্ষতিকর দিকটি তার কাছে ম্লান হয়ে আসবে। তার মনে যাদুকর ও যাদুর প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন সুধারণা জন্মাতে শুরু করবে। আরেক দিন সে যাদুকরকে বলে বসবে, আপনার যাদু তো ভালই মনে হয়, আমাকে একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিনতো! তারপর অন্য দিন আর একটি মন্ত্র শিখে নিবে। দেখতে দেখতে যাদুর প্রতি সে লোকটি আস্থাবান হয়ে পড়বে, নিজে শিখে যাদুর মাহাত্ম প্রচারে ব্যাপৃত হবে। যাদু যে একটি ইসলাম বিরোধী কুফরী কাজ এক পর্যায়ে সেটা সে সম্পূর্ণই ভুলে যাবে। এজন্য সূচনাতেই যাদু থেকে মানুষকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়ত যাদুকরের কাছে যেতেই বারণ করেছে, যাতে মানুষ এ পাপের প্রতি মোহমুগ্ধ না হতে পারে।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, “যে জিনিসের মধ্যে নেশা আছে এর অল্প গ্রহণ করাও হারাম।” আজ যদি কেউ এক চুমুক মদ পান করে কাল সে এক গ্লাস পান করবে, পরশু সে বোতল বোতল গলদকরণ করবে। দেখা যাবে, আস্তে আস্তে লোকটি পুরোদস্তুর মদ্যপ হয়ে গেছে। নেশা ও মদ যেহেতু সকল পাপের উৎস এজন্য শরীয়ত সামান্য পরিমাণ মদ পান করা থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছে। যাতে করে মানুষ বড় গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার দিকে এগুতে না পারে। একেই বলে “সুচনাতেই বন্ধ করা”। শরীয়ত কবীরা গুনাহ সমূহ চুরি, ব্যভিচার, কুফরী ইত্যাদি থেকে মানুষকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে এর সূচনা পূর্বেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, যাতে মানুষ মারাত্মক ও চূড়ান্ত গুনাহের দিকে এগুতে না পারে!

এই পর্যায়ে বলা যায়, তাকওয়া শব্দের অর্থ যদি ‘ভয়করা’ মেনে নেয়া হয় তাহলে ভুল হবে না, কারণ ভয় মানুষকে ছোট ছোট অপরাধ থেকে বিরত রাখে। আর ‘তাকওয়ার’ অর্থ যদি আত্মরক্ষা করা হয় তাতেও অসুবিধা নেই। এতে করে সূচনাতেই আত্মরক্ষার বিষয়টি এসে যায়। যার ফলে পাপাচার পরিত্যাগ করে একটি লোক অত্যন্ত পূতঃ পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে পারে। এই ‘তাকওয়া’মানুষকে দুনিয়ার যাবতীয় অপকর্ম থেকে রক্ষা করে ভবিষ্যতে জান্নাতি জীবনের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। মানুষকে গড়ে তুলে আল্লাহর অতি পছন্দনীয় নিকটবর্তী বান্দারুপে।

আমাদের তাকওয়াঃ

তাকওয়ার উঁচু সিড়িতে আরোহণ করা অত্যন্ত কঠিন। মহান সাধকদের পক্ষেই কেবল তা সম্ভব। তবে আমাদের জন্য গুনাহ থেকে পরিত্রাণের লক্ষে ঝুকিপূর্ণ জায়িয ক্রিয়া-কর্মগুলোও পরিত্যাগ করতে হবে। আর আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করার মাধ্যমেই তাকওয়ার প্রথম ধাপ শুরু। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো নিজ হৃদয়ে এ সত্যটুকু মজবুত ভাবে প্রোথিত করা যে, আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু দান করেন, যাকে ইচ্ছা জীবিত রাখেন, যাকে ইচ্ছা সম্মান দেন, যাকে ইচ্ছা বেইজ্জত করেন। মহা পরাক্রমশালি আল্লাহ্ তাআলার অফুরন্ত ক্ষমতা ও শক্তির বিশ্বাসটুকু এমন ভাবে হৃদয়ে পুতে রাখতে হবে যেন, মহান শক্তিশালী আল্লাহর এঁকে দেয়া গন্ডির ভিতর থেকে কোন পাপানুষ্ঠানের মতো দুঃসাহস বাঁন্দার না হয়। আর এটা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে যে যতো বেশী অবগত হবে, এ নিয়ে যতো বেশী চিন্তা ভাবনা করবে তার হৃদয়ে খোদা ভীতি ততো বেশী মজবুত হবে।

যেমন মনে করুন, একজন প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টকে যতোটুকু ভয় করে একজন গ্রাম্য কৃষক তাকে ততোটুকু ভয় করে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী জানেন, তার সামান্য অপরাধের কারণে প্রেসিডেন্ট তাকে বরখাস্ত করতে পারে । তাকে নাজেহাল করতে পারে। মোট কথা, সে বাদশাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ জ্ঞাত বলে বাদশাহকে এত ভয় করে। আর গ্রাম্য কৃষক লোকেরা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত নয়। যদ্দরুন তার মনে প্রেসিডেন্টকে তার ক্ষমতানুযায়ী ভয় করার অনুভূতি নেই। যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টকে দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে সেখানে গ্রাম্য কৃষকটি প্রেসিডেন্টের সাথে অকুতোভয়ে কথা বলতে পারে। এজন্যই বলা হয়, একজন আলেম ব্যক্তি আল্লাহকে যতটুকু ভয় করেন দ্বীন সম্পর্কে মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তি ততটুকু ভয় করতে পারে না।

একটি ঘটনাঃ বাদশাহ আকবর একবার কাব্য প্রতিযোগিতায় বড় ধরণের পুরস্কার ঘোষণা করেন। দিন তারিখ ঠিক হলো। সারা দেশ থেকে অগণিত কবি মঞ্চে জড়ো হলো। শুরু হলো কাব্য প্রতিযোগিতা। এমন সময় গ্রাম্য এক চৌধুরী হাজির হন কাব্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী সাহেবকে দেখেই আন্দাজ করতে পারলেন, লোকটি গ্রাম থেকে এসেছে। না জানি সে কি বলতে গিয়ে কি বলে ফেলে-শেষে আমার গর্দান যায়। এ ভয়ে তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, চৌধুরী সাহেব! এদিকে আসুন। গ্রাম্য চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিলেন। প্রধান মন্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জন্যে এসেছেন? বললেন আমিও কয়েকটি পংক্তি লিখে এনেছি আজকের মাহফিলে পাঠ করার জন্য। প্রধানমন্ত্রী বললেন, আচ্ছা চৌধুরী সাহবে! আপনার লিখিত কবিতাটি একবার শোনান তো? চৌধুরী কবিতা শুনাতে গিয়ে একজায়গায় বললেন, “গাছের মধ্যে সবচেয়ে বড় গাছ হলো কুল, এর ডালগুলো ঝুলে থাকে আর সবুজ পাতায় লাল লাল কুল থাকে।” অন্য একটি পংক্তিতে বললেন, “আকবর বাদশাহ একজন হারামজাদা।” এ বাক্য শুনে উজিরের পিলে চমকে গেল। সর্বনাশ! হতভাগা নিজের জানও খোয়াবে আর আমার জীবনও ধ্বংস করবে। উজির বললেন, চৌধুরী সাহেব, কবিতা তো বেশ সুন্দর হয়েছে, তবে এই শব্দ কয়টি বদলে দিলে ভালো হয়। চৌধুরী সাহেব বললেন, তাহলে এতদস্থলে কি লিখব? উজির বললেন, লিখে দিনঃ “আকবর জল ও স্থলের মহা পরাক্রমশালী বাদশাহ।” চৌধুরী বললেন, জী আমি তাই বলব।

প্রতিযোগিতা শুরু হল। মঞ্চে উপস্থিত সকল কবিগণ নিজ নিজ কাব্য পারঙ্গমতা প্রদর্শন করলেন। সর্বশেষে চৌধুরীকে বাদশাহ বললেন, চৌধুরী সাহেব! আপনি আপনার রচিত কাব্য উপস্থাপন করুন। চৌধুরী নিজের রচনা থেকে আবৃত্তি করে যখন শেষে এসে বললেন, আকবর জল ও স্থলের পরাক্রমশালী বাদশাহ।” তখন সম্রাট আকবরের কাছে কথাটার অসঙ্গতি স্পষ্ট ধরা পড়লো। কবিতার অন্য অংশের সাথে এর মিল নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, শেষ পংক্তিটি কোন অবস্থাতেই চৌধুরীর রচিত নয়। তিনি চৌধুরীকে বললেন, চৌধুরী সাহেব আপনার কবিতা তো বেশ সুন্দর হয়েছে, তবে শেষ পংক্তিটা অসঙ্গতিপূর্ণ। তখন চৌধুরী ঠায় দাড়িয়ে উজিরকে একটি বিশ্রী গালি দিয়ে বললেন, এ হারামজাদা আমাকে এটা লিখতে বলেছিল, নয়তো আমি লিখেছিলাম “আকবর বাদশাহ একটা হারামজাদা।” এবার সম্রাট আকবর বললেন, হ্যাঁ এটাই ঠিক, পূর্বের কথার সাথে এর মিল আছে। আগেরটুকু ভুল ছিল। বোকা চৌধুরী স্বউৎসাহে বলে উঠলেন, আমি আগে তাই লিখে ছিলাম। সম্রাট আকবর তাকে বহু পুরষ্কার দিয়ে বিদায় করলেন।

চৌধুরীর আকবর বাদশাহকে তার কবিতায় এরূপ বলার মূল কারণ হলো সেছিল কাব্যকলা জ্ঞানে অনভিজ্ঞ এবং আকবরের মর্যাদা সম্পর্কে অনবহিত।

গ্রাম্য লোকেরা খুব সাদা মনের হয়ে থাকে। তাদের মনে যখন যা উদয় হয় তখন তা অকপটে বলে ফেলে। পরিণতির কথা খুব কম চিন্তা করে। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহর দরবারে গ্রাম্য ব্যক্তিদের আগমন

প্রত্যাশা করতেন। তারা এসে রাসূলুল্লাহকে উদ্ভট ও কঠিন প্রশ্ন করবে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি প্রশ্নের জবাব দিবেন। আর এ সুযোগে তারা নতুন জ্ঞানে সমৃদ্ধ হবেন। মূলত রাসূলে আকরামের নবুয়্যাতের মহান মর্যাদা সম্পর্কে স্থানীয় সাহাবায়ে কিরাম যথাযথ অবগত ছিলেন বলে তারা তাকে যা ইচ্ছা তা জিজ্ঞেস করতে পারতেন না। অন্যদিকে গ্রাম্য বদ্দুরা রাসূলুল্লাহর শান ও মর্যাদা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন না।

এজন্য তারা রাসূল (সাঃ)-কে অনেক কিছুই অনায়াসে বলে বসতেন বা জিজ্ঞাসা করতেন, যা সাহাবীগণ সাহস করতেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "একবার রাসুল আকরাম (সাঃ) গণীমতের মাল বন্টন করতে ছিলেন। সেখানে একজন গ্রাম্য বদ্দু ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। গণীমত বন্টন করে সেই ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছাতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। এতে অধৈর্য হয়ে গ্রাম্য লোকটি বলে ফেলল, আয় মুহাম্মদ! এই সম্পদ তো তোমার নয় তোমার বাপেরও নয়, আমাদের তা দিতে দেরী হচ্ছে কেন? রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তাকে শান্তনা দিয়ে বললেন, নিরাশ হয়োনা, অবশ্যই তোমাকে দেয়া হবে।" নবুয়্যাতের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত কোন ব্যক্তির পক্ষে এমনটি নবীজীকে বলা কখনো সম্ভব হতো না। এজন্য গ্রাম্য ব্যক্তিদের আগমনের প্রতি সাহাবীদের ছিল এতো আগ্রহ। গ্রাম্য ব্যক্তিরা আসবে আর আশ্চর্য ধরণের প্রশ্ন করবে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তর দিবেন, সাহাবায়ে কিরামেরও পিপাসা মিটবে, তাদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার সমৃদ্ধশালী হবে।

ক্ষমতা ও মর্যাদা জ্ঞান ভয় ও সম্মানের মূল ভিত্তিঃ

আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা, শক্তি ও মর্যাদা যার কাছে যতোবেশী পরিস্ফুট হবে সে আল্লাহকে ততো বেশী ভয় করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শান সম্পর্কে যতোবেশী উদাসীন ও অজ্ঞ হবে সে ততো বেশী বেপরোয়া হবে। আল্লাহর ভয় আমাদের মধ্যে স্থাপন করার উত্তম প্রক্রিয়া হলো প্রত্যেক ব্যক্তি নির্জনে মনে মনে আল্লাহ তায়ালার মহাশক্তি সম্পর্কে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস, তিনি সকল রাজার মহারাজা। জীবন মৃত্যু তারই হাতে। ধনী, দরিদ্র, সুস্থতা, অসুস্থতা সব আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে। তিনি যা করেন এতে কারো আপত্তি করার ক্ষমতা নেই। তিনি সকল ধন ভান্ডারের মালিক। এসব চিন্তা যদি কোন ব্যক্তি তার হৃদয় তন্ত্রীর গভীরে স্থাপন করতে পারে যে, আমি তো এক নগন্য দাস, যা করি সবই তার সামনে স্পষ্ট। আল্লাহর অগোচরে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তাহলে তার হৃদয়ে অবশ্যই খোদাভীতির বীজ অঙ্কুরিত হবে এবং সে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে।

বাদশাহ জাফরের একটি উপদেশঃ বাদশাহ জাফর ছিলেন মুগল শাসকদের সর্বশেষ শাসনকর্তা। তিনি স্বভাবতঃই অনেকটা সুফী ছিলেন। রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক জটিলতা তাকে আরো সুফী বানিয়ে ফেলে ছিল। বাদশাহ জাফরের কাব্য প্রতিভা ছিলো উঁচু স্তরের। তার বিভিন্ন কবিতা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি অমর পংক্তিতে তিনি বলেছেনঃ

"যতো জ্ঞানী গুণী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিই হোক না কেন, সে যদি অঢেল বিত্ত সম্পদ থাকাবস্থায় সে আল্লাহকে স্মরণ না করে, রোগের বেলায় আল্লাহর ভয়কে ভুলে যায়, তাকে কখনো জ্ঞানী ব্যক্তি বলা যায় না। যে দুর্বল ও ছিন্নমূল মানুষের উপর অত্যাচার নিপীড়ন করে, সে মানুষ নয়। সে মানবরূপী এক চিতা। মানবীয় কোন সৎগুণ তার মধ্যে নেই।"

অন্য একটি পংক্তিতে বলেছেনঃ

"নিজের দোষ ত্রুটি গুলোর প্রতি যদি প্রত্যেক ব্যক্তি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতো যে, আমার নামায, ইবাদত, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে ত্রুটি ভরা, আমি মহাপাপী। এমনটি ভাবতে পারলে মানুষ অপরকে বড় ও উঁচু

মনে করতে পারবে। আর যদি নিজে অহংকারী ও দাম্ভিক হয় তাহলে নিজের দোষত্রুটি সে চোখে দেখবে না, অন্যকে বড় ও সম্মান দেয়ার যোগ্যতা তার থাকবে না। তার অত্যাচার ও অসৌজন্যতায় সমাজ ও পরিবার বিষিয়ে উঠবে।”

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ ভীতি প্রয়োজনঃ আল্লাহ্র ভয় সব সময় মনের মধ্যে জাগ্রত থাকলে মানুষ ধনী গরীব যাই হোক গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ্ পাক একটি হাদীসে কুদ্সীতে বলেছেন, “হে বান্দা! বিত্তশালী অবস্থায় তুমি আমাকে স্মরণ রেখো, তাহলে দারিদ্র অবস্থায় আমি তোমাকে স্মরণ রাখব। সুস্থ থাকাবস্থায় তুমি আমার নির্দেশ মেনে চলো, অসুস্থ হলে আমি তোমার খোঁজ নিব।” এতে বুঝা যায়, বিত্তশালী দরিদ্রতার মধ্যে কোন প্রভেধ নেই। সর্বাবস্থায় সমান ভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ্ বিত্তের মাল ছিনিয়ে নিতে পারেন, পারেন খোদাভীরু দরিদ্রকে ধনী বানিয়ে দিতে। এটা আল্লাহ্র জন্য মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়।

অনুবাদঃ আহমাদ আল-ফিরোজী